ঋতুপর্ণ ঘোষ

অকস্মাৎ দু'টো ঘটনা ঘটে গেল প্রায় একই সঙ্গে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে। একটি সারা বিশ্বের হৃদয়ে আলোড়ন তুলল। অন্যটি ভারতবর্ষের এক নতুন জীবনচর্চার সামনে দাঁড় করাল—প্রচুর তর্ক-বিতর্ক বাদানুবাদের ঝড় এনে।

এক, মাইল জ্যাকসন চলে গেলেন। দুই, ভারতীয় সংবিধানে ৩৭৭ ধারাকে মার্জিত করে, সমকামিতাকে শাস্তিযোগ্যতার অপমান থেকে মুক্তি দেওয়া হল। আপাতভাবে দুটি আলাদা ঘটনা। তেমনভাবে, প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নয়।

কিন্তু আমার কাছে কোথায় যেন একটি ঘটনা অন্যটিকে জড়িয়ে ধরে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। ইংরেজি গান শোনার অভ্যেস আমার বরাবরই কম। ফলে স্কুল শেষ—কলেজ শুরুর জীবনে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব যেমন জ্যাকসন-তরঙ্গে গা ভাসিয়েছিল অবাধে, আমার বেলায় তেমনটি হয়নি।

অথচ আমার ইংরেজি গানের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে থাকাটাও ঘটেনি কোনো দিন। আমার ভাই চিঙ্কুর কল্যাণে—ও আবার কেমন ইংরেজি গানই

শুনত, এবং এক বাড়িতে বড় হওয়ার সুবাদে নানা গানের টুকরো কথা, সুর, তথ্য ভেসেই আসত আমার কাছে, প্রায় যেন অবচেতনেই।

মাইকেল জ্যাকসন মাঝে মাঝে আমাকে মুগ্ধ করেছেন তাঁর স্টেজ পারফরমেন্স দিয়ে। জানি, এটা নতুন কথা কিছু বললাম না—পৃথিবীর কত কোটি মানুষই তো তাঁর মঞ্চম্যাজিকের ভক্ত। তবু, কথাটা নতুন লাগতে পারে এই ভেবে যে মাইকেল জ্যাকসন তাঁর নৃত্যপ্রদর্শনে যেভাবে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় মিশিয়ে দিচ্ছিলেন নারী এবং পুরুষের এক রহস্যময় সম্মিলন—'পুরুষ' এবং 'নারী' নির্বিশেষে সেটা সমান আদরে গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বজুড়ে। টিভিতে দেখলাম জ্যকসনের বিয়োগবক্তব্যে সত্যিই ব্যাকুল—হৃতিক রোশন, প্রভু দেবা, মিঠুন চক্রবর্তী, গোবিন্দা। যাঁরা সকলেই কোনও না কোনও সময় আমাদের কাছে পর্দাপৌরুষের চূড়ান্ত নিদর্শন।

মাইকেল জ্যাকসন ধীরে ধীরে গায়ের রং, মাথার চুল, মুখের গড়ন, শরীরের ভঙ্গিমা সব বদলেছেন— ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যায় যে এই পরিবর্তন এক কৃষ্ণবর্ণ সাধারণ কিশোরের গণ্ডি ছাড়িয়ে চোখ ঝলসানো এক সুন্দরী হওয়ার যাত্রাপথে। তার ফলে মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে দর্শক বা মিডিয়ার প্রবল কৌতূহল ছিল, কিন্তু কোথাও কোনও বীতরাগ বা প্রত্যাখ্যান ছিল না।

মাইকেল জ্যাকসন-এর বিরুদ্ধে কিশোর-নিগ্রহের অভিযোগ ছিল—তারা সকলেই বালক, অর্থাৎ পুরুষ।

অথচ মাইকেল জ্যাকসন প্রথাগত ভাবে বিবাহিত এবং সন্তানের জনক। তাঁর জীবন সাত্ত্বিক ভাবে বা 'নৈতিক' ভাবে অনাবিল ছিল কি না, সেই বিচারে না গিয়ে আমরা অন্তত এইটুকু নিয়ে হয়তো বা সকৌতূহলে ভাবতে পারি যে যৌনভঙ্গির সত্যিই কোনও সমাজনির্দিষ্ট রূপরেখা হয় না। 'পুরুষ' এবং 'নারী' এই দুটি বিপরীত শব্দের মাঝখানে এক অসীম প্রান্তর, যেখানে বসবাস করেন অর্ধনারীশ্বরতার নানা প্রতিভূ।

মাইকেল জ্যাকসন হয়তো বা একজন রূপান্তরকামী মানুষ যিনি কেবল কৃষ্ণ থেকে গৌর নন, পুরুষ থেকে নারীর দিকে চলবার পথের কোনও একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যৌনসঙ্গী হিসেবে একই সঙ্গে বেছে নিয়েছেন অল্পবয়সী কিশোর এবং পূর্ণযুবতী রমণী—নিজের অজান্তেই হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বর্ণ বা লিঙ্গ, যা আমরা আজন্ম ঈশ্বরপ্রদত্ত বলেই জানি, তা-ও কেবল নিজের ইচ্ছায় অনেকটাই পরিবর্তনযোগ্য।

আমরা পরিবর্তনপন্থী, নইলে অপ্রগতিশীল। তা হলে নিজের জীবনটাকে নিজের ইচ্ছা এবং আনন্দ অনুসারে পরিবর্তন করার অধিকার কি আমাদের মৌলিক অধিকার নয়?

সেখান থেকে পৌছব অন্য ঘটনাটিতে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৭ ধারার পরিমার্জনায় বিভিন্ন শহরে সমকামীদের যে গৌরব-মিছিল বেরোল, টিভিতে দেখলাম ক্যামেরাদের স্বাভাবিক ঝোঁক কেবল রমণীসুলভ পোশাক পরা পুরুষদের ওপর। তাদের

পাশে পাশে কিন্তু নীরবে হেঁটে চলেছেন অনেক সাধারণবেশী মানুষ, মিডিয়ার তাদের দিকে কোনও লক্ষ্য নেই। যেন সমকামিতা মানেই 'অসামাজিক' সাজগোজ।—এবং ফলত 'অস্বাভাবিক'।

সেই মিছিলেই হাঁটছিলেন একজন সাধারণ-বেশিনী শান্তস্বভাবা প্রৌঢ়া; তাঁর হাতে একটা প্ল্যাকার্ড— 'Proud Mother' । হয়তো বা তাঁর সমাজ-ঘৃণিত সমকামী-সন্তান সেই মুহূর্তে অন্য কোথাও, অন্য কোনও শহরে বিজয়মিছিলে—বা হয়তো নিজের অন্যকাজ নিয়ে ব্যস্ত। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম মহিলা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। সমকামী বলতেই যে কেবলমাত্র কতগুলো রংমাখা মুখ এটাও যেমন জ্যাকসন আমাদের শিখিয়েছেন, তেমন এই সত্যটাও বোধ হয় শিখিয়েছেন যে স্বেচ্ছা জীবনযাপনের শক্তি যে কোনও কাজল, লিপস্টিকের থেকে অনেক বেশি।

মাইকেল জ্যাকসন-এর শেষকৃত্য হয়ে গেল। ৩৭৭ ধারা নিয়ে মিডিয়ার মাতামাতি অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাঁরা এখন অন্য জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের ক্যামেরায় তাই হয়তো ধরাই পড়ল না আরেকজন প্রৌঢ়ার ছবি—আমার মা।

কিন্তু, আমি মনে মনে জানি, অন্তরীক্ষ বলে যদি কোনও নিঃসীমা পথ থাকে সেখানে ক্লিষ্টপায়ে অশক্ত শরীরে দুর্বল হাতে 'PROUD MOTHER প্ল্যাকার্ড নিয়ে হেঁটে চলেছে আমার মা।

আমার সব নিভৃত নিঃসঙ্গ বিজয়মিছিলের সঙ্গী।